15

যোগাযোগ
উত্তরবঙ্গ : কোচবিহার— কাছারিমোড় (নিউজপেপার এজেন্ট), নীলকুঠি। জলপাইগুড়ি— স্বপন মুখার্জি, ১৭৫/এ, অরবিন্দ কলোনি, আলিপুর দুয়ার জং। কলকাতা : বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল- ৭৩

বিজ্ঞান অন্বেষক

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

বর্ষ -২ তৃতীয় সংখ্যা মে-জুন /২০০৫ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

বন্ধুরা, আবার বসন্ত ঋতু উৎসবে মাদার, শিমুল, পলাশেরা লাল আবিরের রঙে মেতেছে। ফুলের মো-মো গন্ধে ঘোর লেগেছে মৌটুসী পাখির। বসন্তের পুষ্প উৎসবে স্টেজ শিল্পী হিসাবে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন কোকিল, শ্যামা দোয়েলরা এবং টুম-টুম শব্দে বীনাতে সঙ্গত দিচ্ছেন ধরাবাঁধা বীনাশিল্পী বসন্তবৌরী। এরপরই প্রায় জোর করে তোলা হোলো এক শিল্পীকে। তিনি ভীষণ লাজুক, স্টেজ প্রোগ্রাম করেন না। তাই তাকে ছেড়েই দেওয়া হোলো। তিনি ছাড়া পেয়ে উড়তে উড়তে একেবারে গাছের মগডালে অদৃশ্য হয়েই গান ধরলেন। অতি পরিচিত গান—পিউ কাঁহা-পিউ কাঁহা।

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

জলাতঙ্ক

কি এই জলাতঙ্ক : জলাতঙ্ক একটি রোগ। এই রোগের কারণ রেবিস নামক ভাইরাস। এই ভাইরাস কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করে ফলে জিভ দিয়ে লালা পড়ে ও সরযন্ত্রে (Vocal Chord) অসাড় হয়ে যায়। গলা দিয়ে অদ্ভুদ বিকৃত স্বর বের হয়। মুখ দিয়ে লালা পড়ে। রোগী জল গিলতে পাড়ে না তাই জলের আতঙ্কে ভোগে।

কিভাবে ছড়ায় জলাতঙ্ক : বানর, বেজি, শিয়াল ও বিশেষত কুকুর (উষ্ণ রক্তের প্রাণী) এই রোগ

এরপর ৬ পাতায়

বন, বৃষ্টি এবং

শিরোনামকে একটু বদলিয়ে যদি 'বন, সৃষ্টি এবং' রাখা হতো ক্ষতি ছিল না বোধহয়। কেননা এখন এটা সবাই জানে যে বনের সাথে বৃষ্টির একটা আত্মীয়তা আছে, সেটা লতায় পাতায় হোক আর খুব কাছাকাছি হোক সেটা বড় কথা নয়। বন সৃষ্টি বা ধ্বংস যে বৃষ্টিপাত বাড়ায় কিংবা কমায় কিছু নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশের জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তন আনে, একথা আজ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকভাবে সত্য (অবশ্যি বলছি না যে একমাত্র বনের সৃষ্টির জন্য বৃষ্টিপাত সর্বার্থে বাড়ে কমে। অন্যান্য অনেক কারণও আছে যা এখানে সীমিত পরিসরে আলোচ্য নয়)।

বলছিলাম ঐতিহাসিকভাবে সত্য—এর সাথে ডারউইন কথিত বিবর্তন শব্দটাও যোগ করতে চাই। এখন যা 'সাহারা' তা একদা 'সাভানা' তৃণভূমি ছিল। লক্ষ বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে ওই তৃণভূমি লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাহলে কি হবে। 'তটিনি শুকায় কভু রেখা নাহি যায়'— সাহারার বালির তলায় আজও বিশাল এক জলভাণ্ডার সুপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু হায়! বন না থাকায় সেই জল আর উপরে ওঠে না। কেন না, আমরা জানি, উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে তথা সংবহন কলা অর্থাৎ জাইলেমের মাধ্যমে 'রসের উৎস্রোত' ঘটায়। কিন্তু এক্ষেত্রে গাছ-ই নেই তো গাছের শেকড়। তার আবার সংবহন কলা! ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়ে না, বাতাসও ধূলোকণাকে বাধা দেয় না, তাপমাত্রা কমিয়ে এনে 'চেরাপুঞ্জি থেকে' পাঠানো কবির সেই 'একখণ্ড মেঘ' নীচে নামিয়ে আনতে পারে না।

বন সৃষ্টির সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক অতএব আছে বৈকি। মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া লেবাননেও একদা গভীর অরণ্য ছিল। রাজা সলোমন, সেডার অরণ্যে পাঠাতেন তার প্রিয় কাঠুরিয়াদের। এখানে বিজ্ঞানের এক তত্ত্ব মনে রাখা ভাল : অরণ্য ভূপৃষ্ঠকে ঠাণ্ডা রাখে, উদ্ভিদ বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবনের জন্য পরিবেশ থেকে তাপ টেনে নেওয়ার ফলে বৃষ্টিপাত বাড়ে। আর বনভূমির ধ্বংসের ফলে অর্থাৎ 'সবুজ' কমে গেলে এবং বন কেটে বসতি করবার ফলে, বিশেষত: নগরায়ণের ফলে সেই নির্দিষ্ট জায়গার সৌরতাপের প্রতিফলনের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সৌরালোক দীর্ঘতর তরঙ্গের অবলোহিত (Infrared) রশ্মিতে বেরিয়ে যাবার সময় বাতাসকে আরও গরম ও শুকনো করে দেয়।

বনকে অনেকে Continental Ocean বা মহাদেশীয় সাগরও বলে থাকেন। কেন না বনভূমি তার মাটির নীচে জল সঞ্চয় করে রাখে এবং তা বন্যার প্রকোপ কমায়। ভূমিক্ষয় রোধ করে (উদ্ভিদের শেকড়ে শেকড়ে

এর পর ২ পাতায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

পরিবেশ বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর আগেও এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হত না। মানুষের বিশ্বাস ছিল যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে উন্নয়নে ধারা অব্যাহত থাকবে। মানুষ সারা পৃথিবীর সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে। লক্ষ প্রজাতির মধ্যে মাত্র একটি প্রজাতি মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স বাকী সবার উপর অধিকার বিস্তার করবে। এ বিশ্বাস যে কত ভ্রান্ত তার প্রমাণ পাওয়া গেল পঁয়ত্রিশ বছরে।

শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে পশ্চিমী দেশগুলিতে এবং ১৯৫০

এর পর ৫ পাতায়

আপেক্ষিকতার শতবর্ষ

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। তখন জার্মানির সর্বময় কর্তা হিটলার। তার দেশের এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আমেরিকাতে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন তিনি আর দেশে ফিরবেন না। জার্মানি পত্রিকার প্রথম পাতায় সে খবর ছাপা হলো। পরের দিন হিটলারের সৈন্যবাহিনী বিজ্ঞানীর বাড়ি তছনছ করে ফেললো। তার ব্যাঙ্ক একাউন্টের টাকা বাজেয়াপ্ত করলো। ঐ বিজ্ঞানীর মাথার দাম ঘোষণা করা

এরপর ২ এর পাতায়

বন, বৃষ্টি

১ পাতার পর

মৃত্তিকার বন্ধন)। বিশাল বিশাল বৃক্ষ মাটির গভীর থেকে তুলে আনে জল এবং তা বাতাসে ছেড়ে দেয় যা অবশ্যম্ভাবী বৃষ্টিপাতের কারণ। প্রসঙ্গত, বলে রাখা ভাল বনভূমির শীর্ষভাগে বিদ্যুতের বিভব বেশি মাত্রায় থাকার ফলে বৃষ্টিপাত বাড়ে বৈ কমে না। শুধু তাই নয় বন বাতাসের গতি কমিয়ে দিয়ে বায়ুমণ্ডলের আদ্রতাকে শুষে নেয়।

ভূমি যেমন আমাদের ধারণ করে, বনভূমি তেমন আমাদের পরিবেশ রচনা করে, আবহমণ্ডলকে জীবন ধারণের উপযোগী করে তোলে— বনজ সম্পদ এবং বন্যপ্রাণীদের আশ্রয়ের কথা এখানে নাইবা বললাম। এ হেন বনভূমি আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। যেকোনও দেশেরই আয়তনের প্রায় ৩৩ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন খরার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, বনসম্পদের জন্য এবং আরও আরও...। প্রসঙ্গত, সুন্দরবন এলাকায় বিদেশী সাহায্যে পরমাণু চুল্লি করবার যে প্রকল্প এখনো খসড়া পর্যায়ে আছে তা বহু বেকারের আপাত অর্থনৈতিক সুরাহা করবে, কিন্তু তা কেড়ে নেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতির ভারসাম্য। হাঁসের সোনার ডিম একদিনেই পেতে চেয়েছিল গরিব গৃহস্থ—তার ফল কি হয়েছিল তা আমরা জানি, সুতরাং আমাদের হাঁসটাকে বাঁচানোই আশু কর্তব্য। বেশি এবং একেবারে পাওয়ার জন্য সব হারানোর কোনো মানে নেই।

বন সৃষ্টি যে বৃষ্টি বাড়ায় তথা জলের অভাব কমাতে পারে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত (সেন্ট হেলেনা দ্বীপে একবার গাছপালা কাটার ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গিয়েছিল)। তাই সেনেগাল থেকে সোমালিয়া, ইথিওপিয়া থেকে কালাহান্ডি— মানচিত্রের যেখানেই প্রচণ্ড খরা চলেছে, ধরে নিতে বে সেখানেই সবুজের অভাব। তাই জলের জন্য চাই বনের সবুজ — দীর্ঘ বৃক্ষের বীথি ... শেকড়ে শেকড়ে বৃষ্টির প্রার্থনা ...।

—জগন্ময় মজুমদার

(শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়)

আমাদের কথা

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে। ধারাবাবিকভাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। নিয়মিতও বটে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ক্রমশ এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়মিত বিভাগ ছাড়াও নতুন নতুন অনেক বিষয় সংযোজিত হচ্ছে। প্রত্যেক লেখকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আরো বিজ্ঞানের লেখা, মতামত ও নানা প্রশ্ন (প্রশ্নোত্তরের বিভাগের জন্য) পাঠানোর আবেদন রাখছি।

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি পত্রিকাটি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুলে ও বিশেষত উত্তরবঙ্গেও বিস্তারলাভ করেছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জেলাশহরে পত্রিকাটি বিভিন্ন বুকস্টলে বিক্রি হচ্ছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ দ্বাদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ তথা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য বিজ্ঞানদরবার সংস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'মেঘনাদ পুরস্কার' তুলে দেন। সামাজিকভাবে বিজ্ঞানদরবার সংস্থায় দায়িত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পেল। আমাদের আশা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে বিজ্ঞানদরবার কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান অন্বেষক সকলের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

আপেক্ষিকতা

১ পাতার পর

হলো এক হাজার পাউন্ড। শুনে-ঐ বিজ্ঞানী বললেন, 'আমার মাথার দাম এতো তা কখনও ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন, বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে, তার বয়স তখন ছাব্বিশ, কলেজ কিংবা বিদ্যালয়ে পড়ানোর চাকরি খুঁজছিলেন, পাননি। এক বন্ধুর বাবাকে ধরে একটি চাকরি জুটিয়েছেন—পেটেন্ট অফিসের কেরানীগিরি। সারাদিন অফিসের কাজ করে বাড়ি ফিরে পড়াশুনা। এই সময়ের চিন্তাভাবনা নিয়ে তিনি পাঁচটি নিবন্ধ প্রকাশ করলেন একটি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায়। তার মধ্যে একটি সংখ্যায় প্রকাশ পেল আলোক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। এই একই সংখ্যায় প্রকাশ পেল আপেক্ষিকতা নিয়ে গবেষণাপত্র। এই আপেক্ষিকতা নিয়ে আরও নিবন্ধ ১৯০৭ সালে এবং ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালে নানাভাবে প্রচারিত হয়। ১৯১৯ সাল থেকে আপেক্ষিকতা নিয়ে হৈ চৈ তুঙ্গে ওঠে। ১৯২১ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু আপেক্ষিকতা নিয়ে নয়। তিনি নোবেল পান আলোক বিদ্যুৎ গবেষণাপত্রের জন্য। কারণ নোবেল কমিটির কাছে আলোক বিদ্যুৎ সম্পর্কিত কাজটিই বেশি মূল্যবান মনে হয়েছিল।

যে বয়সে ছেলেরা খেলাধূলায় মেতে থাকে সেই বয়সেই অ্যালবার্ট গণিত, পদার্থবিদ্যার নানা বিষয়গুলি নিয়ে মনে মনে জটিল ধাঁ ধাঁ তৈরি করার চেষ্টা করতেন। তার ভাবনায় এসেছিল ৫০ মাইল বেগে ট্রেন ছুটছে। একই দিকে যদি ২০ মাইল বেগে একটি বল ছোড়া হয়। ট্রেনের বাইরে স্থির ব্যক্তি বলটকে কত বেগে ছুটতে দেখবেন। নিশ্চই ৭০ মাইল বেগে। আবার ট্রেনট যদি আলোর অর্দ্ধেক গতিবেগ অর্থাৎ ৯৩০০০ মাইল বেগে ছোটে এবং বল ছোড়ার পরিবর্তে যদি একটি টর্চ জ্বালানো হয় তবে ট্রেনের বাইরে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্থির ব্যক্তিটির চোখে আলোর গতিবেগ কত হবে? শূন্যপথে আলোর গতিবেগ আবিষ্কার কর্তা স্যার ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করেন এই গতিবেগ হবে আলোর গতিবেগের সমান সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। অ্যালবার্টের খটকা লাগল আলোর উৎস এত গতিবেগ অথচ আলোর গতি স্থির থাকছে। নিউটনের ফিজিক্সের ধারণা অনুসরণকরলে ঐ ট্রেনে থাকা ব্যক্তি আলোটিকে দেখবে সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিবেগে আবার ট্রেনের বাইরে স্থির ব্যক্তিটি দেখবে ম্যাক্সওয়েলের মতে ১,৮৬,০০০ মাইল।

এই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন নিউটন আর ম্যাক্সওয়েল দুজনেই ভুল। তিনি আবিষ্কার করলেন গতির কোনও চরম সংজ্ঞা নেই। সময়েরই নির্দিষ্ট কোনও মাপ নেই। কোনও জিনিস চলছে কি চলছে না তা জানার কোনো উপায় নেই। বোঝা সম্ভব নয়। শুধু আপেক্ষিক গতি জানা সম্ভব। এটাই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা।

—মহাদেব মল্লিক

English Grammar Coaching Institute for Class IX - XII and Degree
Letter Marks Guarantee (Condition Apply) Pass Marks Guarantee (No Condition)
Contact T. PAUL
Mob : 9831422719
Nabanagar, Halisahar, North 24 Parganas

পাখি

১ পাতার পর

দখিনা বাতাসে ভর করে সেই সুমিষ্ট সুর ছড়িয়ে পড়লো বহুদূর। চেচাঁমেচি থামিয়ে সব্বাই শুনতে লাগলো মন উদাস করা এই গান। শ্রোতৃমণ্ডলী গানশুনে মুগ্ধ হয়ে তার নাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমার নাম পাপিয়া'।

পাপিয়া : বাংলায় এরা পিউকাঁহা, সাহী বুলবুল বা পাপিয়া নামে পরিচিত। ইংরাজিতে এদের নাম Piedcrested cuckoo। বিজ্ঞানসম্মত নাম *Clamator jacobinus*। মাথার গড়ন অনেকটা সিপাহী বুলবুলির মত ঝুঁটিওয়ালা। আকারে শালিক মাপের তবে খাঁজকাটা লেজটি দেহানুপাতে বেশ লম্বা। ঠোঁটের গড়ন বুলবুলির মতো; রং কালচে বাদামী। কপাল, ঝুঁটি ঘাড় থেকে শুরু করে ডানা পিঠ ও লেজের উপরিভাগ সব কালো রঙের পালকে এবং ঠোঁটের নীচ থেকে গাল, গলা, বুক, পেট ও লেজের শুরু পর্যন্ত সাদা রঙের পালকে ঢাকা। লেজের নিচের রঙ সাদা কালো ডোরা। অর্থাৎ উপর থেকে এই পাখিটিকে কালো রঙের পাখি এবং নীচ থেকে এই পাখিকে সাদাটে বলে মনে হবে। দেহের তুলনায় পা-গুলি ছোটো ছোটো তবে সরু ডালে বসবার উপযোগী। কোকিল যেসব অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে পাপিয়া ঐ অঞ্চলের উঁচু গাছের মগডালে বসে ঠোঁটটি আকাশের দিকে উঁচু করে কিকির ... কিকির ... কুক্-কুক্, পিউ-পিপ, পিউ-পিপি শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে; আর আমরা ভুল করে ভাবি কোকিলই ডাকছে। সকাল-বিকাল দুপুর এমনকি মাঝরাত্রিতেও এদের ডাক শোনা যায় প্রায়ই। মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে অনেকে একে বৃষ্টির দূত 'চাতক' নামে ডাকেন। কুকুলিফর্মেস বর্গের অন্তর্গত এই পাপিয়ার আর এক খুড়তুতো ভাই-বোন আছে যারা ছোপ-পাপিয়া নামে খ্যাত। এদের ইংরাজী নাম Great spoted cuckoo এবং বিজ্ঞানসম্মত নাম *Clamator glamdurius*। পশ্চিমবঙ্গে অপর পাপিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করে যাকে অনেকে 'চোখ গেল' পাখি বলে। ইংরাজীতে Hawk cuckoo এবং বিজ্ঞানসম্মত নাম *Cuculus Varius* নামে পরিচিত। পেটে-বুকে সাদার উপর কালো ছিট্‌ছিট্ দাগ লক্ষ্য করা যায়। মাথায় সেরকম ঝুঁটি নেই, তবে প্রথমে আলোচিত এই দুই প্রকার পাখিদের উভয়েরই পরিযায়ী বৃত্তি বা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবার স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি ব্রহ্মদেশ পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করে নিয়মিত এবং দ্বিতীয়টি গ্রীস, ইতালী, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়ায়। তবে আর যাই করুক, ডিম পাড়ে ভারতেরই বনাঞ্চলে, তাই হিসাব অনুযায়ী পাপিয়া আমাদের দেশেরই পাখি। ছাতারে, কাক, হাঁড়িচাচা, বুলবুলি পাখিরা বাসা তৈরি করে ডিম পাড়লেই এরা তাদের বাসার আশোপাশের গাছের ডালে বসে পিউ কাঁহা-পিউ কাঁহা ডাক শুরু করে দেয়, ডাকাডাকির তীব্রতা বাড়তে থাকলে এরা ঐসব পাখি দ্বারা বিতাড়িত হয়। এসব ঝামেলার সুযোগ বুঝে মেয়ে পাপিয়া সেকেণ্ডের মধ্যে ওদের বাসায় গিয়ে টপাটপ্ দু-একটি ডিম ফেলে দিয়ে সমসংখ্যক ডিম পেড়েই বাসা ছেড়ে পালায়। অংকের হিসাবে বেশ পাকা অর্থাৎ যেকটি ডিম ফেলবে সে কটিই ডিম পাড়বে। প্রথমটি ভাড়াটে বাসায় ডিম পাড়ে ৬/৭টি এবং দ্বিতীয়টি প্রায়ই ১৫/১৬টি (!)। এত ডিম একসঙ্গে পাড়া সম্ভব নয় তাই অনেক সময় দিন ধরে নানা বাসাতে ২/৩টি করে ডিম পাড়তে থাকে। ডিম ফুটতে সময় লাগে ১২/১৩ দিন যা অন্য পাখিদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় নেয়। ফলে এদের ডিমগুলিআগে ফোটে এবং আগে ভাগে ছানারা খাবার পেয়ে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে পিউ কাঁহা-পিউ কাঁহা ডাক ডেকে পালক বাবা-মা-কে অতিষ্ঠ করে তোলে। এরপরই প্রকৃতির নিয়মেই এরা পালক বাবা-মা-র মমতা মাখানো বুকের নরম উষ্ণতার কথা ভুলে যায় এবং অন্যত্র পাড়ি দেয়। পাপিয়ারা খাবারের ব্যাপারে বেশ সরেস এবং কোকিলের থেকেও আলাদা। এরা ডুমুর, বটফল, রসাল লার্ভা, পতঙ্গ, শামুক, কচি পাতা প্রভৃতি খেয়ে খিদে ও তৃষ্ণা মেটায়। কখনো বা এরা মাটিতে জলার ধারে ব্যাঙাচি, জলের ছোটো পোকামাকড়ও খেয়ে থাকে। নির্জন চাষ জমির ধারে টেলিফোন/ইলেকট্রিক তারে বসে পোকামাকড়, শামুক শিকাররত অবস্থায় মাঝেমধ্যে এদের দেখা যায়। সময় সুযোগ পেলেই এরা স্নান করে নিজেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। বসন্তে এদের গান শুনবো বলে কান পেতে অপেক্ষায় থাকি তবু প্রাণীবিজ্ঞানীদের মতে এরা গাইয়ে পাখি নয়। কারণটা কি? কি জানি বাপু! মনে হয় লতা-কিশোরের কণ্ঠে যা আছে এদের হয়তো তা নেই! গ্রামেগঞ্জে ছাতারে, বুলবুল, হাঁড়িচাচার সংখ্যা কমছে ফলে এদের বাসার অভাবে পাপিয়ারা সময়মতো ডিম পাড়ছে না তাই সংখ্যায় কমছে এরা।

—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা

পাপিয়া

৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশদিবস

কর্মসূচী : প্রচারপত্র প্রকাশ, পথসভা

স্থান : কাঁচরাপাড়া স্টেশনের আপ প্লাটফর্ম

সময় : বিকেল ৫টা

সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য

✆ ২৫৮৫-৬০৯৪
বিজলী
পেপার এন্ড ষ্টেশনার্স
কে.জি.আর.পথ, (লক্ষ্মী সিনেমার বিপরীতে) কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

চোখের রঙ চেনা

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী ঠিক কতটা সুন্দর তা ঠিক করে আমাদের এই অমূল্য চোখের দৃষ্টিশক্তি। দৃষ্টিশক্তি ব্যাতীত আমাদের এই সমস্ত পৃথিবীটাই হত ধূসর বর্ণের। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের চোখ কিভাবে সমস্ত রঙ পৃথকভাবে সনাক্ত করতে পারে? তাহলে প্রথমে আমাদের একটু চোখ সম্পর্কে জেনে নেওয়া দরকার। আমাদের চোখের ভিতরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে রেটিনা। এই রেটিনার মধ্যে আমরা প্রধানত দুধরনের কোষ দেখতে পাই। রড কোষ ও কোন্ কোষ। রড কোষ আমাদের কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে ও প্রধানত বস্তু সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধারণা দেয়। কিন্তু বস্তুটির রঙ ঠিক কি? তা জানতে আমাদের চোখ কোন কোষের সাহায্য নেয়। কোন্ কোষ কোন্ বস্তুর রঙ চেনা ছাড়াও বেশি আলোতে বস্তুটিকে দেখতে সাহায্য করে। এই দুই ধরনের কোষে আমরা দুই ধরনের পিগমেন্ট (Pigment) দেখতে পাই। রড পিগমেন্ট ও কোন্ পিগমেন্ট। এই দুই প্রকার পিগমেন্টে রেটিনিন ও অপসিন নামক একপ্রকারের প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন অংশটি সাধারণত অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্রম অনুসারে পৃথক পৃথক হয়। তাই পৃথক পৃথক প্রোটিন আমরা এই পিগমেন্টগুলিতে দেখতে পারি। কোন্ কোষে সাধারণত তিনধরনের পিগমেন্ট থাকে যা কোনও বস্তুর রঙ সম্পর্কে ধারণা দেয়। সেই পিগমেন্টগুলি হল : (১) সায়ানোল্যাব (২) এরিথ্রোল্যাব (৩) ক্লোরোল্যাব। এরা প্রত্যেকে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল হয়। মানুষের চোখ সাধারণত 450-700 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীল।

আমরা বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে যখন কোনও বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করে তখন চোখের রেটিনাস্থিত কোন্ কোষগুলি উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা কমবেশি এক বা একাধিক কোন্ পিগমেন্টগুলিকে উদ্দীপিত করে। এই পিগমেন্টগুলিতে নীল আলো (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 492-450 nm), সবুজ আলো (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 575-492 nm), লাল আলো (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 723-647 nm)কে শনাক্ত করতে পারে। প্রশ্ন হলো তাহলে বাকিসব রঙ কিভাবে আমরা দেখি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি নীল, সবুজ, লাল এই তিনটি রঙকে প্রাথমিক রঙ বলি। এই প্রাথমিক রঙগুলি যদি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশাই তাহলে প্রায় 150 ধরনের রঙ তৈরি হতে পারে। তাই আমরা প্রায় 150 ধরনের রঙ দেখতে পাই। ঠিক এইরকমভাবেই আমাদের চোখ মেলায়। তার অর্থ হল যখন কোনও বর্ণের আলো চোখে পড়ে তখন কোন্ কোষের পিগমেন্টগুলিও একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে উদ্দীপিত হয়ে সেই বর্ণটি অনুভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 580 ম্যানোমিটার (nm) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যখন চোখে পরে তখন রেটিনাস্থিত লাল রঙের জন্য দায়ী কোন কোষ উদ্দীপিত হয়। প্রায় ৯৯ শতাংশ, শুধু তাই নয় সবুজ রঙের জন্য দায়ী কোন্ কোষকে ৪২ শতাংশ উদ্দীপিত করে। কিন্তু নীল রঙের জন্য কোন্ কোষকে কোন রূপ উদ্দীপিত করে না।

সুতরাং কোষগুলি যে অনুপাতে উদ্দীপিত হয় তার মান 99:42:0। তখন এই অনুপাত স্নায়ুতন্ত্র মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। এবং মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অংশ (Visual Cortex) এই আনুপাত দেখে কমলা বর্ণকে অনুভূত করে এবং আমরা বুঝি এটি কমলা বর্ণ। এরকমভাবে যখন 450 ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলো চোখে পরে তখন লাল ও সবুজ রঙ বোঝার জন্য কোন কোষ কোনওরূপ উদ্দীপিত হয় না কিন্তু নীল রঙের জন্য দায়ী কোন কোষ প্রায় ৯৭ শতাংশ উদ্দীপিত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের মানের অনুপাত 0:0:97, তখন আমরা নীল রঙ অনুভব করতে পারি। এরকমভাবে যখন উদ্দীপক মানের অনুপাত 83:83:0 হয় তখন হলুদ রঙ অনুভূত করতে পারি। আসলে আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও আনুপাতিক হারে কোন পিগমেন্টের উদ্দীপনাই রঙ চেনার জন্য দায়ী। উপরোক্ত এই তত্ত্ব বিজ্ঞানী ইয়ং ও হেলমন্ট দ্বারা আবিষ্কার করেন। তাই এই তত্ত্বকে ইয়ংহেলমন্টতত্ত্বও বলা হয়। সমস্ত রঙ যেহেতু তিনটি প্রাথমিক রঙ থেকে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব থেকে পাই তাই একে ত্রিরঙ তত্ত্ব বলা হয়। আবার আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এই তিনটি প্রাথমিক রঙের আলো (নীল, সবুজ, লাল) যদি সমানভাবে তিনটি পিগমেন্টকে উদ্দীপিত করে তাহলে সাদা রঙ অনুভূত হয় কিন্তু কালো রঙ মানে রঙের অনুপস্থিতি।

—চিরজিত মণ্ডল,
সদস্য কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার।

সম্ভব হলে তুমি

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসম্ভব ভালো লেগেছিলো
সেদিন,
বর্ষার জলে ভিজে ভিজে তুমি
নিজের হাতে রোপন করলে
একটি সবুজ চারা
যেদিন।
অবাক হয়ে জানলাম
তোমাকে,
জল-জলাভূমি সংরক্ষণ
কেন প্রয়োজন তা নিয়ে যখন
বোঝাচ্ছিলে দিয়ে প্রাণমন।
দিলে উল্টিয়ে ভাবনাগুলোকে,
চাকরী পেয়েছো স্কুল সার্ভিসে
ভাবছো না আরও আয় হবে কিসে
টিউশনিগুলো দিলে একে ওকে।
ইচ্ছে হয় করি বন্দনা,
তোমার খাঁচার প্রিয় চন্দনা
পাড়ার দুষ্টু দিলো তাকে ছেড়ে
শুনে বললে 'কাজটা মন্দ না'।
ফিরে তাকাই বারবার
তোমার ভরা কারবার
পাশ কাটিয়ে বনের ধারে
মোষ তাড়ানোর কি দরকার?
আসলে তুমি প্রতিদিনের,
মূল্য দিচ্ছ গুণে গুণে
ভাবছো আজই আয়ু শেষ
না হওয়া কাজ করতে করতে
স্ফূর্তি নিয়ে আছো বেশ।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

১ পাতার পর

সালের পর থেকে ঔপনিবেশিকতামুক্ত প্রাচ্য দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে মানুষ এক নতুন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমস্ত আবিষ্কারে এবং সেগুলির ব্যবহারে এক অভূতপূর্ব মাত্রা যোগ করেছে। উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে এই ছিল ১৯৭০ এর আগে পর্যন্ত মানুষের আশা। এইরকম একটা সময়ে পরিবেশ ও মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন কয়েকজন মানুষ। র‍্যাকেল কারসন নামে এক মার্কিন মহিলা লিখলেন একটা বই। নাম 'Silent Spring' অর্থাৎ নীরব বসন্ত। পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্য ফলাফলের কথা বইটির ছত্রে ছত্রে লেখা। নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহারে কীট পতঙ্গেরা মারা পড়বে। পাখিরা হারিয়ে যাবে। বসন্ত হবে নীরব। র‍্যাকেল কারসন বইটি উৎসর্গ করেছিলেন অ্যালবার্ট সোইটারজারকে তাঁরই এক উদ্ধৃতি দিয়ে — 'Man has lost the capacity to foresee and to foretell. He will and by destroying the earth'. মানুষের ভবিষ্যৎকে দেখার দৃষ্টি এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা চলে গেছে। মানুষের অবলুপ্তি হবে পৃথিবীকে ধ্বংস করে।

জল, মাটি, বায়ু, অরণ্যসম্পদ, খনিজ সম্পদ, জৈব সম্পদকে ধরা হয়েছিল অফুরন্ত। এগুলির অধিক ব্যবহারে অধিক আর্থিক লাভ। অধিক লাভে অধিক উন্নয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এক অসামান্য ক্ষমতায় ব্যবহারিক জগতের রূপ বদলে দেবার স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। কিন্তু উন্নয়ন কখনো সীমাহীন হতে পারে না। একথা বুঝতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। অনেক তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়েছে। জনসংখ্যা বাড়ছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্রয়োজন হবে আরও শিল্পজাত সামগ্রীর। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বাড়বে। এসব কিছুর মূল্য দিতে হবে মারাত্মক দূষণ মাত্রার মাধ্যমে।

উন্নয়ন বজায় রাখতে গিয়ে মানুষকে তার যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে চাষের জমি বেড়েছে ১৯ শতাংশ, জনসংখ্যা বেড়েছে ১৯২ শতাংশ। উৎপাদন বাড়াতে হবে। আরও জমি চাই। কিন্তু গড়পড়তা জমির পরিমাণ কমছে। অতি ব্যবহারে মৃত্তিকা ক্লান্ত। উৎপাদন নিম্নমুখী।

এদেশে ১৪টি বড় নদী এবং ছোট ও মাঝারি মিলিয়ে প্রায় ১০০টি নদী আছে। আর আছে অসংখ্য জলাভূমি। আজ প্রতিটি নদীই ভয়াবহ দূষণের কবলে। উন্নয়নের তাগিদে জলাভূমি বদলে তৈরি হচ্ছে নগর ও জনপদ, শিল্প কারখানা। জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য এখনো কোনও জাতীয় আইন নেই। পরিবেশ দপ্তর তৈরি করেছেন বিশেষজ্ঞ বোর্ড। পশ্চিমবঙ্গে টাউন ও কান্ট্রি প্ল্যানিং আইন- ১৯৮২ এবং ফিশারিজ অ্যামেন্ডমেন্ট আইন- ১৯৯৪, জলাভূমি সংরক্ষণ করার নির্দিষ্ট সূত্র।

ভূগর্ভস্থ খনিজ, বিশেষ করে আকরিক লোহা, কয়লা ও তেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হতে চলেছে। পৃথিবীতে জ্বালানি তেলের উৎপাদন ১৯৯৭-৯৯ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে নেমে গেছে।

বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিপুল পরিমাণে জৈব সম্পদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মানুষের আপাত প্রয়োজন মেটাতে ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে জমির যোগান দিতে একাধিক জৈব সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চল অপসৃত হচ্ছে। দ্রুত বদলাচ্ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল। প্রবাল দ্বীপ ও লবণাক্ত উদ্ভিদ জগৎ জৈব সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সম্পদের ৫০ শতাংশ নিশ্চিহ্ন হয়েছে বিগত ১০০ বছরে।

সময়ের সঙ্গে বিপন্ন প্রাণীর তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এর জন্য প্রধানত বনাঞ্চল কমে যাওয়া বা কোনওভাবে জঙ্গল কেটে ফেলাই দায়ী। বিপন্ন প্রাণীর তালিকায় রয়েছে— প্যাঙ্গোলিন, বাঘরোল, নেকড়ে, আমচিতা, লালপাণ্ডা, শেয়াল প্রভৃতি প্রাণী। সেই সঙ্গে বেঙ্গল ফ্লোরিকানা, কালো তিতির, দৈত্যবক, স্পুনবিল, স্যান্ডপাইপার, আইবিস বিল প্রভৃতি পাখি। প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের একটি অনুষ্ঠানে একদল গবেষক আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছেন গরিলা, শিম্পাঞ্জী ও ওরাংওটাংদের মতো মানুষের নিকট আত্মীয়রা স্বাভাবিক বন্য পরিবেশ থেকে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, ২০৩০ সালে বর্তমান বনভূমির ১০ শতাংশ অনুপদ্রুত থাকবে। পরিবেশবিদগণ জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চিত্র আরও করুণ হয়ে যাবে। ২০৩০ সালে এই অঞ্চলে নিরুপদ্রুত বনভূমি বলতে কিছুই থাকবে না।

সভ্যতার আদি পর্ব থেকে মানুষ তার জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। শিল্পে বিপ্লব এসেছে। উৎপাদন আর ভোগের প্রাচুর্য বেড়েছে। এর ফলে কিছু দেশ, কিছু মানুষের উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সবার জন্য সমান উন্নয়ন হয়নি। শুধু তাই নয়, উন্নয়নের পথটি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ বিশেষ নেই। অর্থাৎ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, কয়লা, তেল, আকরিক ব্যবহার করে আমরা আজকের অবস্থায় পৌঁছেছি। যে সম্পদগুলির উপর ভিত্তি করে আমাদের উন্নতি হয়েছে তাদের কোনওটিই কিন্তু অফুরন্ত নয়। তাই প্রশ্ন উঠছে মানুষের এই উন্নয়ন কি ভবিষ্যতেও সমান স্থায়ী হবে? তাছাড়া এই উন্নয়ন বজায় রাখবার জন্য মানুষকে যে মূল্য দেওয়া শুরু করতে হয়েছে সেকথা আগেই বলেছি। গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রভাবে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া, ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের দাপটে ওজোন স্তরে ছিদ্র হওয়ার মতো মারাত্মক সমস্যা তো রয়েছেই। এসবই উন্নয়নের পথে বাধা।

তাই সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ চাইছে উন্নয়নের পথকে সুগম করতে। বাধাহীন করতে। এর ফলে তৈরি হয়েছে স্থিতিশীল বা স্থায়ী বা সহনশীল উন্নয়নের ধারণা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাণ্ডারকে অটুট রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটায় যে উন্নয়ন তাই হল স্থিতিশীল বা স্থায়ী উন্নয়ন। পরিবেশ ও মানুষকে নিয়ে একত্রে সমঝোতা আর সহাবস্থানের ভিত্তিতে উন্নতিই হল স্থিতিশীল উন্নয়নের মূলকথা। বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রাখা এবং পরিবেশের গুণগত মানকে সুরক্ষিত রেখে মানুষের জীবনযাত্রার স্থায়ী উন্নয়ন করা—এই মূল বিষয় দুটির উপর স্থিতিশীল উন্নয়ন গুরুত্ব আরোপ করে।

—গোবিন্দ দাস

Sankar Saha
Member of the Branch Manager's Club for Agents
Life Insurance Corporation of India
Off : Naihati Br., 48 Arabinda Rd., Naihati, 24 Pgs. (N), Pin- 743165.
Resi : 207, Masjit Bati Rd., Binod Nagar, P.O. Kanchrapara, N. 24 Pgs. Pin- 743145.
Tel. (O) 2581-2703, 2580-4041, (R) 2585-7821

জলাতঙ্ক

১ পাতার পর

ছড়ায়। কুকুরের মুখের লালায় অবস্থিত রেবিস ভাইরাস কামড়ানো ক্ষতের মধ্য দিয়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে।

জলাতঙ্কের চিকিৎসায় থালা পড়া ও ঝাড়ফুঁক : কুকুড়ে কামড়ালে রোগীকে ওঝার কাছে নিয়ে গেলে ওঝা মন্ত্রপুত থালা পিঠে আটকে দেয়। ওঝা বলে ওই থালা যতক্ষণ বিষটানবে ততক্ষণ থালাটি পিঠে আটকে থাকবে মালার বিষটানা হয়ে গেলে থালাটি পড়ে যাবে। আসলে থালা বা ধাতু কখনই বিষ এর মতো তরল পদার্থ শোষণ করতে পারে না। তবে কেন থালা আটকায় পিঠে? আসলে রোগীর আতঙ্কে শরীরে সামান্য ঘাম হয় আর ওঝা থালাকে পিঠের উপর জোড় করে চেপে দেয় ফলে পিঠ ও থালার মাঝখান থেকে বায়ু বাইরে বেরিয়ে যায় এবং বাইরের বায়ু থালাকে প্রচণ্ড চাপ দেয় তাই থালাটি পিঠে আটকে যায়। ঠিক এই কৌশলেই টিকটিকি দেওয়ালে হাঁটে। কোথাও বা গঙ্গার জল ও হুকোর জল খাওয়ায়। কোথাও আদাপড়া দেয়।

আবার কোথাও জলাতঙ্কের চিকিৎসায় ওঝারা বিভিন্ন মন্ত্র পড়ে যেমন—

'হাতে করি ফুল ঘটি সরিষার জল
ঘোলশত ডাইন যুগিনের উড়িল পরাণ।'

এইসব মন্ত্র তন্ত্র দিয়ে কখনই জলাতঙ্ক সারে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুকুরে কামড়ালেও জলাতঙ্ক হয় না, কারণ ঐ কুকুরের লালায় রেবিস ভাইরাস থাকে না। এইরূপ অজ্ঞতা ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ফলে ভারতে প্রতিবছর বেশকিছু লোক মারা যান।

জলাতঙ্কের চিকিৎসা : জলাতঙ্কের একমাত্র চিকিৎসা ARV ইনজেকশন নেওয়া। জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস রেবিস একবার দেহে সংক্রামিত হলে কোনভাবেই রোগীকে বাঁচান সম্ভব নয়। তাই আগাম টিকা নিয়ে ঐ ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে হয়। কুকুড়ে কামড়ালে ঐ ক্ষতস্থান বারবার ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে হাসপাতালে গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

মঙ্গলে জল

সম্প্রতি 'মার্চ এক্সপ্রেস' মহাকাশযানের ছবিতে ৯০০ কিমি দৈর্ঘ্য, ৮০০ কিমি প্রস্থ এবং ৪৫ কিমি গভীরতা বিশিষ্ট এক বিশাল সমুদ্রের সন্ধান মিলেছে মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ এলিসিয়ান অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ফেনা ও বুদবুদ সহ জল ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এসেছিল। জল যেহেতু অক্সিজেন থাকার প্রমাণ, তাই সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট জোরদার।

তথ্যসূত্র : নেচার পত্রিকা

বিপদ সংকেত

রাজস্থানের বনদপ্তর ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমীক্ষা করে (২০০৫ সালে) জানিয়েছে ভরতপুরে কেওলাদেও জাতীয় উদ্যানে ও আশপাশে মাত্র ৩৯টি সারস রয়েছে। ১৯৮৩ সালে ঐ সংখ্যাটি ছিল ২৫৮। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা এখনই কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হলে অল্পদিনের মধ্যেই সাইবেরিয়ার সারস-এর মতো ভারতীয় সারসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

খবর

শিমুরালি গার্লস স্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, আলোচনা

৮ ফেব্রুয়ারি শিমুরালি উপেন্দ্র বিদ্যাভবন ফর গার্লস স্কুলে বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসভার আয়োজন করেন। খাদ্যে ভেজাল কিভাবে ধরবেন তা দুধ, চা, রঙিন খাবার, সবজিতে রঙ করা সহ হাতেকলমে দেখানো হয়। কৃত্রিম রঙ ব্যবহৃত খাবারের পরিবর্তে প্রাকৃতিক রঙ দেওয়া খাবার খাওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। জলদূষণ ও জলবাহিত রোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নবমশ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে 'জ্যোতিষ নয়- জ্যোতির্বিজ্ঞান চাই' শীর্ষক পুস্তিকা প্রচার করা হয়।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে 'আলৌকিক নয় বিজ্ঞান'— থালাপড়া, নাড়ীবন্ধ, বিনাআগুনে যজ্ঞ, মদ থেকে জল, চোখ বন্ধ অবস্থায় সনাক্ত করা— প্রভৃতি প্রদর্শনী দেখিয়ে বিজ্ঞানকর্মী পান্নালাল মণি বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সবকিছুর মধ্যে কারণ খুঁজে বার করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে প্রদর্শনী দেখেন। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও আলোচনাসভা খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানমনস্কতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৮ ফেব্রুয়ারি কাঁচরাপাড়া কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটে (হাইন্ডমার্স) স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সারাদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার ৫৪টি স্কুলের ৪০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞানের মজা, প্লাস্টিক দূষণ, জলাশয় সংরক্ষণ-এর প্রয়োজনীয়তা, জলদূষণ ও জলবাহিত রোগ—বিষয়গুলি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মশালা, হাতে কলমে প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা গান-কবিতা পাঠ, 'পথসেনা' পরিচালিত জ্যোতিষ বিরোধী নাটক 'মহাজ্ঞানী' পদাতিক এর গান পরিবেশিত হয়। শংসাপত্র, ট্রফি ও বিজ্ঞানের বই দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিজ্ঞান দরবার ও হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বহু স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা অংশগ্রহণ করেন। বড়জাগুলী রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ, পলাশী আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে গোপাল একাডেমি ও হরিণঘাটা পানপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রতুল কুমার দাস। সভাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা দরকার। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানদরবার বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের কাজ গত ১৯৮০ সাল থেকে চালিয়ে আসছে।

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

সংক্ষেপে

কিয়োটো প্রোটোকল

২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বহু প্রতীক্ষিত কিয়োটো প্রোটোকল কার্যকরী হয়েছে। এই চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষই একে অনুমোদন করেছে। এই চুক্তির লক্ষ্য হল পরিবেশের Greenhouse Gases নিঃসরণ কমিয়ে আনা। যা Global Warming-এর দায়ী। ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের সঙ্গে রাশিয়ার সহমতের কারণেই চুক্তিটির প্রবর্তন সম্ভব হল।

ঐ একই দিনে Clean Development Mechanism (CDM)-এর প্রথম পর্যায় নথিভুক্ত হয়। এই প্রকল্পের ফলে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে আবর্জনা থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ কমানো যাবে এবং ঐ গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে Greenhouse Gases কমানোর ক্ষেত্রে CDM অত্যন্ত সস্তা প্রকল্প।

কিছু তথ্য

সম্প্রতি চীন Greenhouse Gases সম্পর্কিত তথ্যগুলি প্রকাশ করেছে। তথ্যে প্রকাশ, ১৯৯৪ সালে চীন দেশ ২.৬ বিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড, ৩৪.২৯ মিলিয়ন টন মিথেন এবং ৮,৫০,০০০ টন নাইট্রাস অক্সাইড নিঃসরণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণী হল, এই সংখ্যাটা বর্তমানে অনেক বেশিই হবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতে চীনে Greenhouse Gases নিঃসরণ কম হলেও সমগ্র বিশ্বে এর পরিমাণ দ্বিতীয় স্থানে। বেজিং-এর জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি খালিদ মালিকের মতে, এই পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। যেহেতু, বিশ্বের মধ্যে চীন সবচেয়ে বেশি শক্তি (energy) খরচ করে, তাই Greenhouse Gases নিঃসরণ বন্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন সরকার এব্যাপারে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিরও এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই সতর্ককতা মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে এই কাজ বাধা প্রাপ্ত হবে। ভবিষ্যতে জীবনে Greenhouse Gases নিঃসরণ আরও বাড়বে একথা জানিয়েছেন মন্ত্রকের উপপ্রধান।

অ্যাসবেসটস শিল্পের বিপদ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অ্যাসবেস্টস কর্মীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও পরিবেশ কর্মীরা দাবি তুলেছে সমস্ত ধরনের অ্যাসবেস্টসজাত দ্রব্য ও সাদা অ্যাসবেস্টস বাতিলের। ২০০৪ সালের ৮ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'শ্রমিকদের দুর্দশা ও সাদা অ্যাসবেস্টস বাণিজ্য-এর ওপর সম্মেলন'এ এই দাবি তোলা হয়েছে। সব ধরনের অ্যাসবেস্টস থেকেই ক্যানসার রোগের সৃষ্টি হয় এবং এর উপশমের কোন পথ নেই। একজন কর্মী অ্যাসবেস্টস কারখানা বা খনি থেকে অবসরের কয়েক বছর পরেও এই ক্যানসারের সৃষ্টি হতে পারে—এই তথ্য জানিয়েছেন খনিকর্মী স্বাস্থ্যের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান এস কে দাভে। তিনি বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা দেশে নেই। অধিকাংশ রোগীরই বেশিদিন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। তারা হয় হাসপাতালে ভর্তি থাকে নয়তো মারা যায়। সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি এইচ. মহাদেবন জানিয়েছেন যে প্রায় চল্লিশটি দেশ ইতিমধ্যে অ্যাসবেস্টসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কৌতূহল

এই বিভাগে নিয়মিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রশ্ন প্রকাশকের কাছে পাঠাতে পারে। নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। আমরা যথাসম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেব।

(ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নগুলি অপরিবর্তিত ভাবে ছাপানো হল)

১) এক বিঘা আয়তনের জলাশয় থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়; ৫ বিঘা আয়তনের বনভূমি থেকে একই পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায়। তাহলে বনসংরক্ষণ বন মহোৎসব নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের? কেবল জলাভূমি সংরক্ষণ করলেই তো হয়।

দেবাশীষ দেবনাথ, একাদশ শ্রেণী, নগরউখরা উচ্চ বিদ্যালয়

উ: প্রথমে বলি, বনসংরক্ষণ কি শুধু O_2 পাওয়ার জন্য? তা একেবারে ঠিক নয়। বনসংরক্ষণের গুরুত্ব পরিবেশে অনেক বেশি। তবে ১ বিঘা জলা জমিতে যে পরিমাণ O_2 পাওয়া যায় তা ৫ বিঘা বনভূমির সমান এই কথাটি সত্য। তোমাকে আগে জানতে হবে O_2 তৈরি করে উদ্ভিদ কি ভাবে। আমরা জানি সবুজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে O_2 তৈরি করে। ১ বিঘা জলাজমিতে যে পরিমাণ ছোট ছোট উদ্ভিদ থাকে বিশেষ করে ভাসমান প্লাংটন (অর্থাৎ উৎপাদক) তার সংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ এবং এদের সালোকসংশ্লেষের হার অনেক বেশি ঐ বড় বড় বৃক্ষের চেয়ে।

তুলনা করলে দেখা যায় পাঁচ বিঘা জমিতে যে পরিমাণ সবুজ উদ্ভিদ আছে তাদের থেকে বর্জিত O_2 এর পরিমাণ ১ বিঘা জলা জমিতে অবস্থিত সবুজ উদ্ভিদের সমান। কারণ: (১) জলা জমিতে উদ্ভিদ সংখ্যা অনেক বেশী। (২) সালোক সংশ্লেষের হার বেশী।

সঞ্চয় সরকার, শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।

২) মানুষের চোখের উপর কোলেস্টেরল হয় কেন?

স্নেয়ি গোস্বামী, ষষ্ঠ শ্রেণী, রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ

উ: প্রথমেই বলি প্রশ্নটি সঠিক নয়। মানুষের কোলেস্টেরল থাকে রক্তে। কোলেস্টেরল বলতে বুঝি রক্তে দ্রবীভূত ফ্যাট বা চর্বি। এই ফ্যাট আমাদের দেহে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য, তবে এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হওয়া চাই। যদি ফ্যাটের পরিমাণ কোন কারণে বেড়ে যায় তবে সেই ফ্যাট রক্তে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং রক্ত নালীর উপর জমে যায়। ফলে দেহের নানান বিপত্তি দেখা দেয়। যেমন হার্ট অ্যাটাক।

তেমনি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়লে চোখের পাতার উপরে সাদা সাদা চিহ্ন দেখা যায় একে চোখের অলঙ্কার বলে। এই চিহ্ন দেখেই বোঝা যায় দেহে কোলেস্টরলের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আছে।

সঞ্চয় সরকার, শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

৩) পুকুর কিংবা অন্য কোন জলাশয়ের জলে কিছু মাছ আছে। সেই জলাশয়ের জল মনে করুন বিশুদ্ধ। কিন্তু এই জলাশয় যদি অন্য কোন অবিশুদ্ধ বা দূষিত জলাশয়ের সাথে মিলিত হয় তবে কি স্বচ্ছ জলাশয়ের মাছগুলিও দূষিত বা খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যাবে? যদি হয়, তবে

এর পর ৮ পাতায়

কৌতূহল

৭ পাতার পর

অধিকাংশ গ্রামে তো দেখা যায় জলাশয়ের জল অবিশুদ্ধ। ফলে গ্রাম্য জীবনের খাদ্য তথা মাছের পরিকাঠামো কিভাবে রক্ষিত হবে?

অনির্বান মণ্ডল, নবমশ্রেণী, নগরউখরা উচ্চ বিদ্যালয়

উ: অবিশুদ্ধ জল বলতে বুঝি যে জল পান করলে জীব দেহের ক্ষতি হয়। তা হলে কোন জল অবিশুদ্ধ? যে সমস্ত জলে, পেষ্টিসাইড, হার্বিসাইড, ইনসেক্টি সাইড, হেভিমেটাল (সিসা), রেডিও অ্যাকটিভ ধাতু, এছাড়াও নানা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও আদ্যপ্রাণী মিশ্রিত জলকে আমরা অবিশুদ্ধ জল বলি। এই সমস্ত জলে প্রতিপালিত মাছ মানুষের দেহে মন্থর গতিতে হলেও ক্ষতি করতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে।

অধিকাংশ গ্রামের পুকুর বা জলে এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ খুবই অল্প পরিমাণে মেশে। তুলনামূলকভাবে এই সমস্ত হেভি মেটাল ও রেডিও অ্যাকটিভ বহু শহর ও শহরতলি এলাকায় (কারণ এখানে বড় বড় কলকারখানা থেকে এই সমস্ত পদার্থ নির্গত হয়) কোনও না কোনও জলাশয়ে মেশে। এই মিশ্রিত জলই বিশুদ্ধ নয়। ঐ জল মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি করে। এর ফলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের পেটের সমস্যা ও চর্ম রোগ।

সঞ্চয় সরকার, শিক্ষক, শ্যামনগর, কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

৪) নারকেল গাছের ডাবে জল আসে কিভাবে?

শর্মিলা দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, কাঁপা উচ্চ বিদ্যালয়

উ: নারকেল গাছে ডাব হচ্ছে ফল। আমরা জানি ফলের মধ্যে গাছ তার খাদ্য জমা করে। তেমনি নারকেল গাছ তার খাদ্য ছোট নারকেল (ডাব) বা ডাবের মধ্যে জমা করে। অন্যান্য গাছ তার খাদ্য শাঁস এর মধ্যে বা শাঁস হিসাবে জমা করে। তেমনি ডাবের মধ্যে নারকেল গাছের খাদ্য জলীয় তরল হিসাবে জমা করে। ঐ জলীয় তরলকে আমরা ডাবের জল বলি। যখন ডাব পরিপক্ক হাতে থাকে তখন ডাবের মধ্যে শক্ত খোলক তৈরী করে। এবং ঐ খোলকে গায়ে শাঁস হিসাবে খাদ্য জমা করে।

সঞ্চয় সরকার, শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

৫) আকাশে ছায়াপথ কেন থাকে?

অর্পন ও বাসুদেব, সপ্তম শ্রেণী, মাদারপুর সুভাষ হাইস্কুল।

উ: ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা রাতের আকাশের একটি অতি পরিচিত দৃশ্য। মেঘমুক্ত রাতে এবং প্রধানত অমাবস্যার রাতের মেঘমুক্ত আকাশে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত এই ছায়াপথ দেখতে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হলো আকাশে এই ছায়াপথ দেখা যায় কেন? আমরা জানি, আমাদের গ্রহ পৃথিবী যে নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে তার নাম সূর্য। সূর্যের মতো আকাশে আরও বহু নক্ষত্র আছে, যাদের আমরা রাতের আকাশে দেখতে পাই। এদের আমরা প্রচলিত কথায় তারা বলি। মহাকাশে যে অসংখ্য তারা দেখা যায়, সেগুলি কিন্তু সারা মহাকাশ জুড়ে সুষমভাবে বিন্যস্ত নয়; বরং সেগুলি স্থানে স্থানে জোটবদ্ধভাবে আছে। প্রতিটি জোটে অসংখ্য তারা আছে, আর জোটবহির্ভূত স্থানে একটিও তারা নেই। তারার এই জোটগুলিকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড বা galaxy।

আমাদের সূর্যও এমনই একটা ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রায় দশ হাজার কোটি তারা আছে। আমরা যখন আকাশের এদিকে-ওদিকে তাকাই, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কিনারার দিকে আমাদের চোখ যায়। ঐ দিকে কেবলমাত্র যে মোট তারার সংখ্যাই বেশি তা নয়, তারাগুলির সন্নিবেশের ঘনত্বও সবচেয়ে বেশি। একারণেই রাতের আকাশে আমাদের চোখ ঐ দিকে গেলে আমরা কোনও একটা নক্ষত্রকে আলাদা করে চিনতে পারি না। লক্ষ লক্ষ তারা, তার পিছনে আরও লক্ষ লক্ষ তারা, তার পিছনে আরও লক্ষ লক্ষ তারা, এভাবে থাকার ফলে কোনও নক্ষত্রই পৃথকভাবে আমরা দেখতে পাই না। আমরা যা দেখি তা যেন কোনও সাদা ধোঁয়া বা হালকা মেঘের তৈরী রাস্তা। যা আকাশের একদিক থেকে আরেক দিকে চলে গেছে। একেই আমরা ছায়াপথ বলি। রাতের জ্যোৎস্নাহীন মেঘমুক্ত আকাশে এটিই আমরা দেখতে পাই।

অর্চন নন্দী, শিক্ষক, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়।

(৬) তারা খসে কেন?

ভানু ঘোষ, সপ্তম শ্রেণি, মাদারপুর সুভাষ হাই স্কুল

উ: আকাশের বুক চিরে আচমকা কোন চলমান জ্যোতিষ্কের খানিকটা সোজা পথে গিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনাই হল 'তারা খসা' বা 'উল্কাপাত'। তাই তারা খসা মানে এই নয় যে আকাশের গায়ে থাকা এক বা একাধিক তারার খসে পড়া। সৌরজগতে চারপাশে মহাকাশের যে বিস্তৃত অংশ রয়েছে তাতে আছে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রহাণুপুঞ্জ এবং ধুমকেতুদের ক্ষয়িত, স্খলিত দেহাংশ। এসব বস্তু পিণ্ড অবিন্যস্তভাবে ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকে। এদের ভর খুবই নগণ্য। এদেরকেই বলে উল্কা। এরকম ভ্রাম্যমান কোনও উল্কা যখন পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে তখন অভিকর্ষের টানে এরা ক্রমবর্ধমান বেগে ভূপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের দিকে নামতে নামতে যখন এরা বায়ুমণ্ডলের ঘন অংশে পৌঁছায় তখন বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয় এবং উল্কাটি জ্বলে উঠে এবং আলো বিকিরণ করতে থাকে। অধিকাংশ উল্কাই আয়তনে ছোট বলে খুব অল্প সময়েই এরা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ফলে 'তারা খসার' মতো ঘটনা ক্ষনিক সময়ের জন্যই হয়। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৮০ থেকে ১১০ কিলোমিটার উচ্চতাতেই সাধারণত তারা খসার ঘটনা ঘটে।

রতন দেবনাথ, প্রধান শিক্ষক, গুড়দহ উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামনগর।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। সম্পাদক মণ্ডলী— প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)। ফোন - ২৫৮৫ ৬০৩২, ২৮৭৬ ০৭২০, ২৫৮৮ ০৮২১, ২৫৮৭ ৬২৭৫

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার।

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.